ই'তিকাফ

নিজেকে উৎসর্গ করতে এক নির্জনবাস মু'মিন আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে হয় ধন্য মমত্ববোধের চেতনায় হয় উজ্জীবিত

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্‌

ই'তিকাফ কী

রমযানের শেষ দশ দিন কোন কোন রোযাদার নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহ্‌ তা'লার যিকরে (যপগাঁথায়) নিমগ্ন রাখার উদ্দেশ্যে মসজিদে এসে অবস্থান নেন। এরূপ আল্লাহ্‌-র স্মরণে একনিষ্ঠভাবে বিভোর থাকতে মসজিদকে আবাসনের স্থান হিসেবে গ্রহণ করাকে ই'তিকাফ বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে ই'তিকাফ এক আশারা বা এক দশক সময় কালের জন্য হয়ে থাকে। কোন এক রমযান মাসে রোযার সংখ্যা ২৯ (উনত্রিশ) হবে না ৩০ (ত্রিশ), যেহেতু তা পূর্ব থেকে জানা থাকে না এ কারণে এক দশক সংখ্যা পুরা করতে মহানবী (সা.) রমযানের শেষ দশক-এর একদিন পূর্ব থেকেই ই'তিকাফ শুরু করতেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখন থেকে ই'তিকাফ শুরু করেন ও কীভাবে শুরু করেছেন আর কতদিন ধরে ই'তিকাফ করেছেন তা এই নিবন্ধে তুলে ধরা উদ্দেশ্য, এ থেকে পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ্‌!

ই'তিকাফের মৌলিক উদ্দেশ্য

বিশ্ব-জগত সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই অর্থাৎ মানবজাতি এক আল্লাহ্‌-র উপাসনা যে কাল থেকে শুরু করেছে, সেই কাল থেকেই ই'তিকাফ' অবিচ্ছেদ্যভাবে ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত হয়ে আছে।

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্‌-র ইবাদতের উদ্দেশ্যে ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম যে গৃহটি নির্মিত হয়েছে তা হলো পবিত্র কা'বা গৃহ আর এ গৃহ নির্মাণের অন্তর্মূলেই 'ই'তিকাফ' এর চেতনা বিদ্যমান। বিশ্বে যত ধর্মমত প্রচলিত আছে তার প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন রঙে 'ই'তিকাফ' এর ভাবাদর্শ দেখতে পাওয়া গেলেও ইসলামের ধর্ম-বিধানে তা স্থায়ীরূপে পরি-পূর্ণতা লাভ করেছে।

ই'তিকাফ বৈরাগ্য অবলম্বনের শিক্ষা দেয় না

সাধারণ অর্থে ই'তিকাফ বলতে জাগতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌'র স্মরণে সময় কাটানোকে বুঝায়। কোন কোন ধর্মে এর চরমভাবাপন্ন দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন– খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা এবং হিন্দু সান্যাসীরা নিজেদেরকে জাগতিক সর্বপ্রকার সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে সারাটা জীবন বৈরাগ্যে কাটিয়ে দেয়।

ইসলাম কারো পুরো জীবনকাল বৈরাগ্য অবলম্বন করাকে সমর্থন করে না। খ্রীষ্টধর্মে প্রচলিত সন্ন্যাসবাদ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত কোন শিক্ষা নয় বরং এটা পরবর্তীকালে ধর্মের নামে প্রক্ষিপ্ত এক ব্যবস্থা, যা মানবের জন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ ধর্মীয় বিধানের ও জীবনাচারের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ই'তিকাফ'-এর অন্তর্নিহিত মর্ম

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সার্বজনীন ও সর্বকালের জন্য। এক খোদার ইবাদতের জন্য তৌহিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করতে আদর্শিকভাবে পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণের সাথে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, পবিত্র কুরআন প্রদত্ত শিক্ষার অংশ হিসাবে এটা নিশ্চিত যে পবিত্র কাবাগৃহের সাথে ই'তিকাফ'এর সম্পর্ক আদি ও অকৃত্রিম।

ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা, আরবের প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি দল নবী করীম (সা.)-এর সাহচর্য্যে থাকতো আর যেসব বিষয় আগে থেকে তাদের অজানা ছিল সেসব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতো, আর এভাবে তারা জ্ঞান তথা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতো, সমস্যা ও সঙ্কটের প্রজ্ঞাপূর্ণ সমাধান শিখে নিজ ধর্মের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো। এভাবে **তাফাক্কুহ্‌ ফিদ্বীন** অর্জন করে নিতো। পরবর্তীতে ফিরে গিয়ে অন্যদেরও তা শেখাতো। ইসলামের ইতিহাসে বিস্তারিত বিবরণসহ ওইসব দলের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা ওই উদ্দেশ্য ও আদেশকে কার্যকর করতে মদীনায় নবী করীম (সা.)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতো, ধর্ম শিখতে সেখানে কিছু দিন কাটাতো, একদল বিদায় হওয়ার পর দ্বিতীয় দল, পরে তৃতীয়দল, এরপর পুণরায় আরেক দল– এভাবে আসতেই থাকতো। এক ধারাবাহিকতা চলতে থাকতো আর এ ধারাবাহিকতায় ধর্মের স্থায়ীত্ব ও মজবুতির উপকরণ নিহিত রাখা হয়েছিল।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, ধর্ম শেখার উদ্দেশ্যে বাহরাইন থেকে একবার চৌদ্দজন প্রতিনিধির একটি দল এসেছিল। অনুরূপভাবে, হাযরে মাওত (ইয়েমেন) থেকে আশি জনের প্রতিনিধিদল এসেছিল। এভাবে বনু তমহীম গোত্রের সত্তুর-আশি

জনের একটি দলও এসেছিল। এসব দল **বাকাও বিল মদীনাতে মুদ্দাতাঁই ইয়া তাআ'ল্‌লামুনাল কুরআনা ওয়াদ্‌ দীনা ছুম্মা খারাজু ইলা কাওমিহিম**– ধর্ম শিখেছে, শিক্ষাপ্রাপ্তরা পরবর্তীতে নিজ জাতির কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ধর্ম শিখিয়েছে।

এভাবে যথেষ্ট সংখ্যায় লোকদের কেন্দ্রে আসতে হবে, তবেই যথার্থরূপে ইসলাম ধর্মের সেবা করা সম্ভব হবে। পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট যে সব কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে তা জানা সহজতর হবে।

وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ

(সূরা বাকারা: ১২৬)

অর্থাৎ- আর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে (এ মর্মে) তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিলাম, 'তোমরা উভয়ে আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকুকারী (ও) সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রেখো।'

ওয়াল আকিফিন-এ সেই উদ্দেশ্যেই বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কাবাগৃহ এ কারণেই নবরূপে নির্মাণ করা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে এমন এক জাতি সৃষ্টি করা লক্ষ্য যারা নিজেদের জীবন খোদা তা'লার পথে উৎসর্গকারী হয়ে 'বায়তুল্লাহ্‌' নির্মাণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করবে। এমন এক সার্বজনীন জাতির উদ্ভব ঘটানোর উল্লেখ এখানে রয়েছে, যাদের মাঝে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশের প্রতনিধিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ উদ্দেশ্যটি কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

'ওয়া আনতুম আ'কিফুনা ফিল মাসাজিদ' (সূরাতুল বাকারা ঃ আয়াত ১৮৮)। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তোমাদের ব্যাপারে এধারণা পোষণ করা হচ্ছে তোমরা মসজিদে **ই'তিকাফ** (ইবাদতের জন্য নির্জনবাস)-এ বসবে। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল পার্থিব বিষয় ও সম্পর্ক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিছুদিন একাগ্রচিত্তে খোদার জন্য নিজ জীবনের প্রতিদিনের চব্বিশ ঘন্টা সময় কাটিয়ে যাও যাতে উৎসর্গকরণের স্পৃহাকে জীবন্ত করে নেয়া যায়। আর যেহেতু নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ বানানো হয়েছে', এজন্য **ওয়া আনতুম আ'কিফুনা ফিল মাসাজিদ**-এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে আমার ভালোবাসায় উৎসর্গীকৃত হয়ে তোমাদের খন্ড খন্ড ভাবে কিছুটা করে সময় কাটাতে হবে; আল্লাহ্‌র ঘর পবিত্র কাবাগৃহ হলো কেন্দ্র-বিন্দু আর আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে তোমাদেরকে এর প্রতিচ্ছায়াও নির্মান করতে হবে অর্থাৎ অকৃত্রিম ভাবে একই ধাঁচে একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করতে একই ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতা সৃষ্টি করতে জায়গায় জায়গায় **ছায়া কেন্দ্র** খুলতে হবে, যেগুলো **বায়তুল্লাহ্‌র** প্রতিচ্ছবি হবে আর তা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যও হবে তা-ই যা **বায়তুল্লাহ্‌** প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

আল্লাহ্‌ তা'লা এখানে এটাই বলেছেন যে **আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ**– প্রত্যেক জায়গায় যেখানে উম্মতে মুসলেমা তাক্‌ওয়া (খোদাভীতি) এর ভিত্তিমূলে **বাযতুল্লাহ্‌র** প্রতিবিম্ব-প্রতিচ্ছায়া প্রতিষ্ঠিত করবে সেখানে তোমাদেরকে উৎসর্গীকৃত হয়ে ই'তিকাফে বসতে হবে, না হলে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না।

কাবাগৃহ নির্মানের একটি উদ্দেশ্য এ-ও যে, জাতির উৎসর্গকারীগণ অর্থাৎ প্রত্যেক এলাকার, প্রত্যেক স্থানের, প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর যে উৎসর্গকারী রয়েছে তারা কেন্দ্রে বা ছায়া-কেন্দ্রে এসে সমবেত হতে থাকুক আর ইতিকাফে বসে যাক। লক্ষ্যণীয় যে 'উৎসর্গ' (ওয়কেফ্‌) ও 'দেশত্যাগ-দেশান্তর' (হিযরত) এ-দুয়ের মধ্যে খুবই সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই কেবল মক্কা থেকেই নয় বরং অন্যান্য এলাকা থেকেও বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিরা নিজেদের এলাকা পরিত্যাগ করে এমন কী নিজ গোত্রকে ছেড়ে দিয়ে সাধু-সন্যাসীর ন্যায় মদীনায় এসে বসে পড়তো আর এখানেই পড়ে থাকতো।

তাদের সে হিযরত ছিল (দেশত্যাগ) নিজ জাতি গোষ্ঠী ছেড়ে যাওয়া বা নিজ দেশ পরিত্যাগ করা– এটা সে রকমের ছিল না, যা ছিল মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে সে স্থান ছেড়ে যাওয়ার হিযরত, তবে এমনটি করা এক উৎসর্গকারীর (ওয়াকেফ্‌) পক্ষেই সম্ভব হয়ে থাকে, যে নিজ এলাকা ছেড়ে, স্বীয় আত্মীয়তার বাঁধন ছেড়ে, আপন পরিবার-পরিজন ছেড়ে, নিজ সহায় সম্পদ ছেড়ে দিয়ে খোদার জন্য কেন্দ্রে এসে পড়ে থাকে আর পরবর্তীতে কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কাজ করতে বেরিয়ে পড়ে। যেমন– **ইয়েমেন'**-এ **আআ'রীয়্যাণ** নামে এক গোত্র ছিল। সেখানকার ধর্মপরায়ণ বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন হযরত আবু মূসা আশআ'রী (রাযি.)। তাঁর সাথে আশি জন সদস্য হিযরত করে মদীনায় চলে আসেন। অনুরূপ আরও অনেক গোত্র রয়েছে। ইতিহাসে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। নবী আকরাম (সা.)-এর পবিত্র সাহচর্য লাভ করে উপকৃত হতে তারা মদীনায় চলে এসেছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)-ও রয়েছেন।

মহানবী (সা.) এর জীবনে ই'তিকাফ

আমরা মহানবী (সা.) এর পবিত্র জীবনাদর্শে 'ই'তিকাফ' এর প্রকৃত শিক্ষার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। আল্লাহ্‌ তা'লার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুমহান আদর্শ আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন মহানবী (সা.)। তিনি (সা.) আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন জাগতিক ভাবে একেবারে বিচ্ছিন্ন বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন-যাপন, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীকে ভয় পেয়ে পলায়ন প্রবৃত্তি বৈ অন্য কিছু নয়। মহানবী (সা.) এর জীবনাচার পরিপূর্ণ ভাবে কর্মমুখর থাকলেও তিনি ইহজাগতিক লালসাপূর্ণ আকর্ষণ থেকে নিজেকে এমনভাবে সরিয়ে রাখতেন, জাগতিক বিলাস-ব্যসন কখনই তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। প্রকৃত জিহাদ এটাই– এক মুজাহিদ 'জিহাদ' এর প্রতিটি প্রান্তরে অবস্থান করে বিপদাবলীর তুফানের মধ্যেও নির্ভিক দৃঢ়তার সাথে মুকাবেলা করবে তবুও সঠিক পথ থেকে সে বিচ্যুত হবে না।

এ হলো বাস্তব সম্মত সেই পথ যা দ্বারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সাথে মহানবী (সা.) সম্পর্ক গড়েছেন, 'সিরাতুল মুস্তাকীম' সহজ-সরল পথ, মধ্যম পন্থার পথ, যা মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌ তা'লা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব তাদেরকে সেই পথে 'ইস্তেকামাত'-দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ্‌ তা'লার সাথে গড়তে হবে নিবিড় সম্পর্ক, অটল-অটুট বন্ধনে নিজেদেরকে করতে হবে আবদ্ধ। ই'তিকাফের মূলতত্ত্ব হলো জাগতিক বিষয়াদি থেকে নিজেকে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য দূরে রাখা এবং বৈশ্বিক দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীকে

তুচ্ছ জ্ঞান করে পশ্চাতে রেখে দেয়া! লক্ষণীয় বিষয় হলো, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 'ই'তিকাফ'কে উন্নত মানের ধার্মিকতা হিসাবে আখ্যায়িত করেন নাই বরং তিনি একে এক কুরবানী বা আত্মোৎসর্গ বলে চিহ্নিত করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.) রমযানের মাঝখানে ই'তিকাফ শুরু করতেন এবং ২১ রমযানের রাত পর্যন্ত তা জারী রাখতেন। এভাবে কিছুকাল ধরে তিনি (সা.) ই'তিকাফ করতে থাকেন আর সাহাবাগণও (রা.) ধীরে ধীরে তাঁর সাথে যোগ দিতে থাকেন।

ই'তিকাফে রয়েছে আত্মোৎসর্গের অনুপ্রেরণা

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্য থেকে কেউ কেউ মসজিদে এসে নিজেদের 'হুজরা' স্থাপন করতেন। একবার মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) মসজিদে তার 'হুজরা' বসালেন। উম্মুল মু'মিনীনগণ তা জানতে পেরে ধার্মপরায়ণতার এই কাজে অংশ নিতে তারাও আকাঙ্খী হলেন। মসজিদে এসে তারাও 'হুজরা' বসালেন, তবে এদের মধ্যে অনুমতি নিয়েছিলেন কেবলমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)।

পরবর্তীতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মসজিদে এসে এতগুলো হুজরা যা উম্মুল মু'মিনীনগণ বসিয়েছিলেন, তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। আশ্চর্য হয়ে তিনি বললেন, 'এটাই কি তাদের ধর্মপরায়ণতার মূলতত্ত্ব?' অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে তিনি (সা.) বললেন, ধর্মনিষ্ঠতা মানুষের অন্তর থেকে উৎসারিত হয় অন্যের দেখাদেখি বা অপরের সাথে রেষারেষি থেকে তা আসে না। তিনি এতটাই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, সেই রমযানে তিনি (সা.) মসজিদে আর ই'তিকাফ করেন নাই, সেই রমযানের পরবর্তী মাস অর্থাৎ শাওয়াল মাসে তিনি এই ক্ষতি পূরণ করে নেন।

এই ছিল মহানবী (সা.)-এর আলোকজ্জ্বল জীবনাচার পদ্ধতি। তিনি (সা.) তাঁর সহধর্মিণীগণকে বারণ করেন নাই বা তাদেরকে নিজেদের হুজরা সরিয়ে ফেলতেও বলেন নাই, কারণ তিনি নারীদেরকেও মসজিদে অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছেন, যেমন হযরত আয়েশা (রা.) এ বিষয়ে পূর্ব থেকে অনুমতি প্রাপ্ত ছিলেন। অতএব অন্যান্য উম্মুল মুমিনীনদেরও সেই অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানানোর কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এমন উদাহরণ থেকে একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যাবার প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হয়। এ কারণেই এ বিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল, নিজেকেই এমন অবস্থা থেকে সরিয়ে নেয়া। তিনি তাঁর সহধর্মিনীগণকে তিরস্কার করেন নাই আর স্ত্রীগণকেও লজ্জিত করেন নাই এইভাবে তিনি নারীর মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন আর ই'তিকাফ না করে স্বয়ং তিনি কষ্ট পেয়েছেন বটে, তবে শাওয়াল মাসে একাকী নির্জনে তাঁর সেই অতৃপ্ত বাসনা তিনি পুরণ করে নিয়েছেন।

এবারে প্রশ্ন উঠে রমযানের শেষ দশ দিন "ই'তিকাফ"-এর এই রীতি কোথা থেকে এলো? মহানবী (সা.) একবার বলেন, তিনি 'লাইলাতুল কদর'-সৌভাগ্যের রজনীর সন্ধান পেয়েছেন ২১ রমযানে, যখন তাঁর ই'তিকাফ সমাপ্ত হয়। তখন থেকে তিনি (সা.) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে রমযানের শেষ দশ দিন তিনি (সা.) মসজিদেই অবস্থান করবেন। ঐ এক বছর তিনি (সা.) দুই বার ই'তিকাফ পালন করেন, প্রথমটি রমযানের মাঝের ১০ দিন আর অপরটি শেষ দশ দিন।

ই'তিকাফকালীন মহানবী (সা.) এর অনুপম দৃষ্টান্ত

সেই থেকে মহানবী (সা.) প্রতি রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে অবস্থান করে ই'তিকাফ করতেন। ই'তিকাফ করা অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় অহেতুক কোন কাজে জড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই, মসজিদের ভিতরেও নয় বাইরেও নয়। একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তবেই বাইরে যেতে পারে আর সাজগোজ করা ও আত্মম্ভরিতা প্রদর্শনের অনুমতি মোটেই নাই।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একবার মসজিদে ই'তিকাফরত থাকাকালে তিনি (রাযিআল্লাহু আনহা) তাঁর (সা.) সাথে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে যান আর এমন আলাপ-আলোচনায় ই'তিকাফের অন্তর্নিহিত মর্মের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তাকে (রা.) বিদায় দিতে মহানবী (সা.) স্বয়ং দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দেন। মহানবী (সা.) এর এমন প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তাঁর (সা.) অসাধারণ চারিত্রিক মর্যাদারই পরিচায়ক অর্থাৎ ই'তিকাফ কালীন এই সময় মসজিদ ছিল মহানবী (সা.) এর সাময়িক আবাসনের স্থান। অতএব তিনি (সা.) তাঁর অতিথি সহধর্মিণীকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিয়ে বিদায় জানান।

সেই সময় ২ জন মদীনাবাসী মুসলমান আনসার ঐ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ে এই দৃশ্যটি দেখে। তারা মহানবী (সা.)কে 'সালাম' জানালে প্রত্যুত্তর দিয়ে মহানবী (সা.) তাদেরকে দাঁড়াতে বলেন, আর সেই সাথে জানালেন যে, তার সাথের মহিলা তাঁরই সহধর্মিণী সাফিয়া (রা.)। এতে দুই সাহাবী ব্যথীত হয়ে বললেন, 'হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমরা কি আপনার সম্পর্কে কোন মন্দ ধারণা করেছি? আপনি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন কেন? উত্তরে মহানবী (সা.) বললেন, মানবদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্ত যেমন সঞ্চালিত হয় শয়তানও তদ্রুপ চারিদিকে ঘুর-ঘুর করতে থাকে। আমি শংকিত যে, কোন কারণে তোমরা না তার চক্করে পড়ে যাও, এইজন্যই আমি তোমাদের কাছে বিষয়টি পরিস্কার করলাম।' এমনই অতুলনীয় মানসম্পন্ন ছিল মহানবী (সা.) এর ই'তিকাফ।

গভীর মনোনিবেশের সাথে তিনি (সা.) ইবাদত করতেন, নামাযে তাঁর (সা.) এই একাগ্রতা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেত রমযানে, আবার শেষের দশ দিন তা যেতো আরো বেড়ে। ইবাদতে তাঁর এই একনিষ্ঠতা আর আত্মবিলীনতা তাঁর ওফাত প্রাপ্তির বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মৃত্যুর বছর মহানবী (সা.) মসজিদে ২০ দিন ধরে ই'তিকাফ করেছেন। সম্ভবত তিনি তাঁর 'মৃত্যুবরণ' এর বিষয় আগাম জানতেন, তবে তিনি তা জনগণের সামনে প্রকাশ করেন নাই, কেননা তিনি (সা.) তাঁর সাহাবাদের কষ্ট দেখলে সইতে পারতেন না।

রাহমাতুল্লিল আ'লামীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ই'তিকাফ কালে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের পরম আকুতি নিয়ে আর মানবকল্যাণের অপার মমতা বুকে ধারণ করে একান্তে মসজিদে যেভাবে সেজদা প্রণত হয়ে কাটাতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এই রমযানে সেই মানের ই'তিকাফ করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন!